দেবলোক থেকে মানবলোকে

অঞ্জন চক্রবর্তী

[ঠাকুরবাড়ির ব্রাহ্মধর্মের চৌহদ্দি থেকে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ উত্তোরিত হয়েছেন মানুষের ধর্মে। তার লেখায়, কর্মে সর্বত্রই ঘটেছে তার প্রতিফলন। বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অঞ্জন তুলে ধরেছেন দেবলোক থেকে মানবলোকে উত্তরণের সেই বিষয়টি।]

দৈবক্রমে যে সুযোগ আমি পেয়েছিলুম সে কথা সে কথা মনে পড়লে আমার ভাগ্য-বিধাতাকে আমি নমস্কার করি। আমি যখন জন্ম নিয়েছি তখন আমাদের পরিবারের আশ্রয় জনতার বাইরে। সমাজে আমরা ব্রাত্য।"

(শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান, ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬)

সংগীত-শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ফিরে গিয়েছেন বাল্যকালে এবং উন্মোচিত করেছেন এক গভীর ক্ষতচিহ্নের। পিরালির ব্রাহ্মণ হিসাবে তাঁরা ছিলেন সমাজবিচ্ছিন্ন, ব্রাত্য। একজন বালকের উপলব্ধিতে এই বিচ্ছিন্নতা যে কতটা বেদনাবহ তা 'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের আত্মজীবনীমূলক কবিতাটিতে পেয়ে যাই আমরা ঃ

যখন বালক ছিলেম ছিল না কেউ সাথি,
দিন কেটেছে একা একা
চেয়ে চেয়ে দূরের দিকে।
জন্মেছিলেম অনাচারের অনাদৃত সংসারে,
চিহ্ন-মোছা, প্রাচীরহারা।
প্রতিবেশীর পাড়া ছিল ঘন বেড়ায় ঘেরা,
আমি ছিলেম বাইরের ছেলে, নাম-না-জানা।
ওদের ছিল তৈরি বাসা, ভিড়ের বাসা —
ওদের বাঁধা পথের আসা-যাওয়া
দেখেছি দূরের থেকে
আমি ব্রাত্য, আমি পঙ্‌ক্তিহারা।

(ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত)

এই আবাল্যলালিত বিচ্ছিন্নতাবোধ রবীন্দ্রনাথকে বিক্ষিপ্ত, আত্মবিধ্বংসী করেনি, বরং ব্যাপ্ত, প্রসারিত করেছে তাঁকে। ধনী পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি তাই অনুভব করেছেন সমাজের দরিদ্র প্রান্তিক মানুষের ব্যথা-বেদনা, অনুভব করেছেন ভারতের সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতিকে এবং তাঁর ধর্মবোধ পৌঁছেছে বিশ্বমানবের দরবারে। তাই অন্যরা যখন "তুলে নিয়ে গেল ওদের দেবতার পূজায়/ শাস্ত্র মিলিয়ে বাছা বাছা ফুল" তখন

তার দেবতার জন্য রেখে দিয়ে গেল "সকল দেশের সকল ফুল/ এক সূর্যের আলোকে চিরস্বীকৃত" আর সেই ফুল দিয়ে তিনি উচ্চারণ করেছেন তার নিজস্ব মন্ত্র ঃ

" হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ, পরিত্রাণ করো —
ভেদচিহ্নের তিলক পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

(ওরা অন্ত্যজ ওরা মন্ত্রবর্জিত)

আমরা বুঝতে পারি ১৯৩৬র পত্রপুটের বহুদিন আগে কোন মন থেকে তিনি লিখেছেন 'চিত্রা'র 'ব্রাহ্মণ' কবিতা (৭ই ফাল্গুন,১৯০১)। জাবাল সত্যকাম যখন গৌতমের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতে যায় তখন প্রথা-অনুযায়ী তাকে গোত্র পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয়। বালক যখন মা-র কাছে ফিরে গিয়ে এই প্রশ্ন রাখলো তখন মা নতশিরে শোনালেন তাঁর লজ্জামাখা জীবনসত্য ঃ

যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে।
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে;
গোত্র তব নাহি জানি তাত।

সত্যকাম যখন গৌতম ঋষির কাছে মাতৃবর্ণিত এই সত্য কথাই শোনায় তখন তথাকথিত কৌলিন্যময় বালকেরা, যাদের পিতৃপুরুষ হয়তো জবালার মতো নারীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে যথেষ্ট উৎসাহী, তারা 'অনার্যের অহংকার'কে পরিহাস করে ওঠে। কিন্তু যিনি একদিন বলেছিলেন একমাত্র ব্রাহ্মণেরই শাস্ত্রপাঠে অধিকার আছে তাঁর কণ্ঠেই আজ শোনা গেল ভিন্ন সুর ঃ

অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।

ফিরি আবার সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধের সেই অনুচ্ছেদে, যেখানে বালক বয়সের বিচ্ছিন্নতার কথা পেড়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা সত্ত্বেও তাঁর অগ্রজরা এমন সব সুর নিয়ে পরীক্ষা করেছেন যা ঠিক ছকে বাঁধা নয় এবং তার পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে ঃ

"এর মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই, চিরাভ্যস্ত সেই সব প্রাচীন গানের নিবিড় আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও তাঁরা আপন মনে যেসব গান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তার রূপ তার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; গীত-পণ্ডিতদের কাছে তা অবজ্ঞার যোগ্য। রাগ-

রাগিনীর বিশুদ্ধতা নষ্ট করে এখানেও তাঁরা ব্রাত্য শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

শুধু "উচ্চ সংগীত" নয় "জনসংগীত" সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান রবীন্দ্রনাথ, যার প্রবাহ সাধারণ মানুষের জীবনস্রোতের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। সেই বহমান সংস্কৃতিকে অনুভব করেই তিনি রবীন্দ্রনাথ ঃ

"এই তো গেল উচ্চ সংগীত। জনসংগীতের প্রবাহ — সেও ছিল বহু শাখায়িত। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যেমন ছোটো-বড়ো নদী-নালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি রসের দৌত্য করেছে নানা রূপ ধরে। যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কবির গান, কীর্তন মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে। লোকসংগীতের এত বৈচিত্র্য আর কোনো দেশে আছে কিনা জানিনে।"

লোকসংগীতের এই আস্বাদন রবীন্দ্রনাথের কাছে নিছক তাত্ত্বিক ব্যাপার নয়। তাঁর বাড়িতেই বসত যাত্রা, পাঁচালির গান তাকে শুনিয়েছিলেন কিশোরী চাটুজ্জে। এখানেই শেষ নয়, বালক রবিকে পাঁচালির দলে পেলে যে সাংঘাতিক কিছু ঘটে যেত এমনটিই বলতেন কিশোরী চাটুজ্জে, আর বালক রবির মনও উদ্বেল হ'ত সেই স্বপ্নে। ঠাকুরবাড়ির এই সন্তানটির নিজস্ব ব্রাত্যমনস্কতার আরেকটি ঝলক আমরা দেখলাম। উত্তরকালে গল্পগুচ্ছের দরবারে, পদ্মার সাম্রাজ্যে তিনি দেখেন মনের মানুষের সাধক বাউলকে

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা,
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

এই সন্ধান রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু বাইরের দেখা জিনিস থেকে যায় নি। তিনি একে আত্তীকৃত করেছেন তাঁর আপন সাধনায়। তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গড়ে উঠেছে দেবালয়ের পাকা ভিতের বাইরে। বঙ্কিমের মতো 'কৃষ্ণচরিত্র' না লিখে বিবিধ ঐতিহাসিক মানুষদের নিয়ে তিনি লিখেছেন 'চারিত্রপূজা' যাঁদের অন্যতম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঈশ্বর বা ধর্মের ধারই ধারেননি। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর চর্চা বিদ্যাসাগরের অনন্য মনুষ্যত্বের জয়গানে মুখরিত যা কোনোদিন সামাজিক সংকীর্ণতায় বদ্ধ থাকেনি ঃ

"রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখনো রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন-কি (চন্ডীচরণবাবুর গ্রন্থে লিখিত আছে) কামাটাড়ে এক মেথর জাতীয় স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটিরে উপস্থিত থাকিয়া

স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্ধমান- বাস-কালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমান-গণকে আত্মীয় নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন।"

সমাজে যাদের আমরা সরিয়ে রাখি তাদের সেবাই ছিল বিদ্যাসাগরের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের মতে বিদ্যাসাগরের দয়াব্রতে একধরনের বলিষ্ঠতা ছিল যা তাঁকে সঠিক অবস্থানে সঠিক পদক্ষেপে পৌঁছে দিত। বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির বৃদ্ধবয়সে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের ঘটনায় একদিকে যেমন বালিকাটির আশু বৈধব্য আশঙ্কা তাঁকে চোখের জলে ভাসিয়েছিল, তেমনি শ্রদ্ধাভাজন বাচস্পতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করার কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি অনায়াসে পৌঁছেছিলেন। কাশীর ব্রাহ্মণগণ তাঁর কাছে অর্থানুকূল্য দাবি করলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। যখন তাঁর বিশ্বাসের কথা জানতে চাওয়া হল তখন তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন "আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবীতে বিরাজমান"।

"হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে — করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন" — বিদ্যাসাগর-চরিতের আরম্ভেই এই উপস্থাপনা থেকে বোঝা যায় সাম্প্রদায়িকতার কলুষ সম্পর্কে কতখানি উদ্বিগ্ন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বারবার তাঁকে অবতীর্ণ হতে হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার নামে অন্ধ ধর্মমোহ ও মনুষ্যহীনতার বিরুদ্ধে মননশীল সংগ্রামে। সাম্প্রদায়িকতার সর্ববৃহৎ ভয়ংকর গহ্বরটিকে ঠাহর করতে পেরেই তিনি গান গেয়ে রাখীবন্ধনে উদভ্রান্ত জাতিকে বাঁধতে পথে নেমেছিলেন। ঠিক একই ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার করাল আবহে গর্জে ওঠে তাঁর কণ্ঠ ঃ

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।

(ধর্মমোহ ঃ ৩১ বৈশাখ ১৩৩৩)

যে মানুষের ভালোকে মানে সে-ই কবির সম্মানের পাত্র। যে নাস্তিক বুদ্ধির আলো জ্বেলে মানুষের হিতকর্মে রত সে-ই ধার্মিক, ধার্মিকতার আড়ম্বর না করাই তার মহত্ত্ব।

এতো গেল ১৯২৬ সালের অভিঘাত। ১৯৩৯ সালের ২৮ মার্চ লেখা 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' কবিতায় পরিচিতা ফলবিক্রেতা মেয়ের ধর্ষণ ও তৎপরবর্তী খুনের খবরে যন্ত্রনাদগ্ধ কবির কণ্ঠে হারিয়ে গেছে মাঙ্গলিকতার নিত্যবৃত্তে আশ্রয়

নেবার অভীপ্সাঃ

শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে —

'উপায় নাই রে নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে।

অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কখনো আগমার্কা নাস্তিক হিসেবে প্রকাশ করেন নি। তাঁর কথায়, লেখায়, সাধারণ আলাপচারিতাতেও ঈশ্বরের কথা এসে গিয়েছে। শেষ বয়সে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে এমনটা নয়। কিন্তু তাঁর অবচেতনের উদ্দীপনাকে তিনি যেভাবে প্রকাশ করেছেন রাণী চন্দের সামনে তা সত্যিই অবাক করে ঃ

"কাল একটা র‍্যাশনাল স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু ভুলে গেছি সব — কী যেন কার ছেলে মারা গেছে — মানত করেছে দেবতার কাছে — যদি দয়া করেন ইত্যাদি। আমি বললুম কেন এই-সব হাত জোড় করে দেবতার উপর ভক্তি দেখিয়ে তাঁকে অপমান করো। প্রকৃতির নিয়ম সব। 'দেবতা' 'দেবতা' বলে চিৎকার করা বৃথা, তাঁরা নিস্পৃহ। মানুষের দুঃখ মানুষই দূর করতে পারে — এইসব বলে যাচ্ছি। কিন্তু কেউ শুনলে না। রাত্রি-বেলা নাস্তিকতা করার সুবিধে আছে।"

(আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ ঃ রাণীচন্দ)

শেষের কথায় কৌতুকের চিহ্ন স্পষ্ট। 'দেবতার উপর ভক্তি দেখিয়ে তাঁকে অপমান করো' তে দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়নি। হয়তো এ এক রকমের অভ্যাস বা সংস্কার। কিন্তু বহুদিন আগে যে জয়সিংহ বলে উঠেছিলো 'দেবী নাই' যে রঘুপতি মূর্তি ছুঁড়ে ফেলেছিলো জলে তার পিছনে স্রস্টারও কি কোনো জটিল আবেগ অভিমান ছিলো?

(২)

আমরা এর আগে 'বিদ্যাসাগর-চরিত' প্রসঙ্গে আলোচনায় এই নাস্তিক মহাপ্রাণকে অন্ত্যজ রমণীকে শুশ্রূষা করতে দেখেছিলাম, দেখেছিলাম দরিদ্র মুসলমান প্রতিবেশীকে বর্ধমান বসবাসকালে সাহায্য করতে। আমরা রবীন্দ্র উপন্যাসের জগতে এমন একজন প্রবলপ্রাণ নাস্তিককে পাই যিনি পাড়ার মুসলমান চামারদের উন্নয়ন ও সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, এমনকি প্লেগে আক্রান্ত মুসলমান চামারকে নিজের বাড়ীতে এনে সেবা করতে গিয়ে স্বয়ং রোগগ্রস্ত হন এবং মারা যান। তিনি 'চতুরঙ্গ'র জ্যাঠামশাই জগমোহন মল্লিক। লোকে তাঁর পান্ডিত্যের জন্য তাঁকে বাংলার মেকলে বা বাংলার জনগন বলতো। লক্ষণীয়, পাণ্ডিত্যের অনুষঙ্গে না হলেও চরিত্র বিচারে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে জনসনের তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যাসাগর চরিতে। বাইরে কঠোর বিদ্যাসাগর মাতৃজাতির দুঃখ দেখলে কেঁদে ফেলতেন, অশ্রুবিরল ব্যক্তিত্বের জগমোহন পুরন্দরের হাতে লুণ্ঠিতা ও পরিত্যক্তা ননীবালাকে দেখে চোখের জল সামলাতে

পারেন নি।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে জগমোহনের তফাৎ এখানেই যে বিদ্যাসাগরের কর্মযজ্ঞ যেমন বহুধাবিস্তৃত ছিল জগমোহনের ক্ষেত্রে তার গণ্ডি অনেকটাই ছোটো। নিজে পাশ্চাত্য দর্শনকে পাঠ্যভুক্তীকরণের পক্ষে অবস্থান নিলেও তাঁর কর্মসর্বস্ব জীবনে তাঁর দর্শন ও বিশ্বাস নিয়ে ভাবনার তেমন প্রক্ষেপ ধরা পড়ে না এবং তা চর্চার বিষয়ও হয়ে ওঠে না। তপোব্রত ঘোষ 'চতুরঙ্গ' বিষয়ে তাঁর যুগান্ত-সৃষ্টিকারী গ্রন্থ 'শ্রীবিলাসের ডায়েরী'তে জ্যাঠামশায়ের দার্শনিক বিশ্বাস নিয়ে বিস্তৃত ও গভীর আলোচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে কোঁতের 'ধ্রুববাদ' তথা পজিটিভিজম এবং বেন্থাম-মিলের হিতবাদী ভাবনার উপস্থিতি দেখা যায়। যে জগমোহন সাকার বা নিরাকার ঈশ্বরের বদলে সজীব চামারকে দেবতা জ্ঞান করেন তিনি কোঁতের 'বিরাট মানবসত্তা'র উপাসক। অন্যদিকে প্রচুর লোকের প্রভূত হিতসাধনের মধ্যে প্রথমে 'গরজহীন গরজ' ও পরে আত্মবিসর্জনের যে দৃষ্টান্ত তিনি রেখেছেন তা মিল কথিত হিতবাদের সঙ্গে সঙ্গত।

নাস্তিকতা ও 'প্রচুর লোকের প্রভূততম হিতসাধনে' নিবেদিতপ্রাণ জগমোহন কি তাহলে নিছকই একজন যান্ত্রিক ধ্বজাধারী কঠোর ব্যক্তিত্ব? না, রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই বাদসর্বস্ব মানুষ ছিলেন না এবং বাদের বাইরের ব্যালকনিতে দাঁড়ানো মানুষকে তিনি গভীর মমতার সঙ্গেই পর্যবেক্ষণ করেন, যদি না তিনি অমানবিক বা ভ্রষ্টাচারী হয়ে ওঠেন। বলাই বাহুল্য, জগমোহন তা হননি। প্রথম দৃষ্টান্ত শচীশের বাবা হরিমোহন যখন পারিবারিক বিভাজনের পর শচীশের জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে থাকার পিছনে তাঁর হীন কৌশলের দিকে ইঙ্গিত করেন, তখন তিনি সন্তানতুল্য শচীশকে 'গুডবাই' জানাতে বাধ্য হন। শচীশ কিন্তু বাপের সঙ্গে না থেকে মেসে গিয়ে ওঠে। ওদিকে শচীশকে এমন করে বিদায় জানাতে বাধ্য হওয়ায় জগমোহনের বুক ফেটে যায় ঃ

"মাথা গণনায় যে মানুষটি কেবল এক, হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত। শচীশকে কি এক দুই তিনের কোঠায় ফেলা যায়। সে যে জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল।"

বিজ্ঞান এখানে হেরেছে ঠিকই, কিন্তু বিজ্ঞানের ভিত্তিতে হাঁটা জগমোহনের ওই ব্যথিত বুক আমাদের তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল করে। বস্তুতঃ বিজ্ঞান-বিশ্বাসী হলেও জগমোহনের আবেগপ্রবণতা আমরা আগেও দেখেছি এবং ননিবালার কাছে নিজের বাল্যবয়সের সখাদের কাছে সংগৃহীত 'পাগলা জগাই' নামটি সকৌতুকে স্বয়ং উন্মোচিত করতে দ্বিধা হয়নি তাঁর। হ্যাঁ, হিতবাদী-ধ্রুববাদী জগমোহন পাগলা জগাই; স্নেহপ্রবণ জ্যাঠামশাই এবং ননিবালার আবেগময় পালক পিতাও এবং এই বৈচিত্র্য জগদীশ ভট্টাচার্য কথিত 'রবীন্দ্র সংস্কার' সম্পর্কে অবহিত পাঠকের কাছে আন্তরিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং উপভোগ্যও।

তপোব্রত ঘোষ 'শ্রীবিলাসের ডায়েরী'তে ননিবালাকে আশ্রয় ও সুরক্ষা দিতে জ্যাঠামশাই যে ভয়ানক সামাজিক হিংস্রতার মুখোমুখি অকুতোভয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। এই হিংস্রতার সবচেয়ে মারাত্মক দিক ছিল তাঁর কুলাঙ্গার ভাইপো পুরন্দরের ভূমিকা, যে এই অধ্যায়ের খলনায়ক। পুরন্দরের বারবার হানার পাশাপাশি ছিল জগমোহনের এক পিসির হরিমোহনের হীন চক্রান্তের দূতী হিসেবে দেখা দেওয়া এবং সেখানেই স্ফূরিত হল জগমোহনের আবেগময় প্রতিবাদ ঃ

"তোমরা ধার্মিক, তোমরা এমন কথা বলিতে পার, কিন্তু পাপ যদি বিদায় করি তবে এই পাপিষ্ঠের গতি কী হইবে?"

পিসিমা ফেল করায় এবার আসরে অবতীর্ণ এক দিদিমা, প্রেরক বলাই বাহুল্য হরিমোহন। আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ জগমোহনের প্রতিক্রিয়ার মানবিক দাঢ্য ঃ

দিদিমা গালে হাত দিয়া কহিলেন, মা বলিস কাকে রে!

জগমোহন কহিলেন, জীবকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তাঁকে। যিনি প্রাণসংশয় করিয়া ছেলেকে জন্ম দিল তাঁকে। সেই ছেলের পাষণ্ড বাপকে তো আমি বাপ বলি না। সে বেটা কেবল বিপদ বাধায়, তার তো কোন বিপদই নাই।

তপোব্রত ঘোষ এই প্রসঙ্গে কোঁতের দৃষ্টিতে ম্যাডোনার কথা উল্লেখ করেছেন। ম্যাডোনা ননিবালার মতই কুমারী মা যার সামনে কোঁত শ্রদ্ধায় নত। জ্যাঠামশায়ও ননিবালার প্রণামে আপত্তি জানিয়ে বলেন তিনি বয়সে বড়ো হলেও ননি তারও বড়ো কারণ সে মা। কিন্তু জ্যাঠামশায়ের জীবনে ননির আবিভার্বের সঙ্গে বাল্মিকীর জীবনে বালিকা সরস্বতী বা রঘুপতির জীবনে অপর্ণার আবির্ভাবের তুলনা বোধহয় সঠিক নয়। রঘুপতির জীবনে অপর্ণার আবির্ভাব শুধু তার 'জীবন সাধনার অসম্পূর্ণতাকে উদ্‌ঘাটিত করে গিয়েছে" এমন নয়, তার অভ্যাসের নিষ্ঠুরতা নগ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যাকে থামাতে জয়সিংহকে আত্মবলিদান দিতে হয়েছে। অপর্ণার উপস্থিতির প্রাবল্যকে ঠেকাতে যে আত্মঘাতে জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়েন রঘুপতি, সেখান থেকে তোলে অপর্ণাই। অপর্ণার হাত ধরেই তার পতন থেকে উঠে আসা। ননির আবির্ভাব আত্মীয়বর্জিত, একান্তবাসী, দুর্মর পণ্ডিত ও সেবাব্রতী জগমোহনের অন্তরের লুকনো ফল্গুধারাকে উন্মোচিত করেছে যার সূত্রপাত একদম আবির্ভাবের সূচনাতেই ঃ

জগমোহনের চোখে সহজে জল আসে না; তার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। তিনি শচীশকে বলিলেন, শচীশ, এই মেয়েটি আজ যে লজ্জা বহন করিতেছে সে যে আমার লজ্জা তোমার লজ্জা। আহা ওর ওপরে এতোবড়ো বোঝা কে চাপাইল!

পুরন্দরের উৎপাতের বাড়াবাড়ি যখন চরমে পৌছলো তখন জগমোহন ভাবলেন ননিকে নিয়ে পশ্চিমে চলে যাবেন। শচীশের আশঙ্কা তার দাদা পুরন্দর কোথাও যেতে দ্বিধা করবে না। সে তাই সমাধানসূত্র হিসেবে ননিকে 'সিভিল বিবাহ' করার

প্রস্তাব দেয়। জ্যাঠামশায় উৎফুল্ল হন। মানব ইতিহাসে লম্পটের অত্যাচারে চূড়ান্তভাবে অপমানিত হবার পর পুনরায় নতুন জীবনের আশ্বাসে দাঁড়িয়ে ওঠা নারী দেখা যায়নি এমন নয়। কিন্তু চরিত্র হিসাবে ননি অত্যন্ত অর্ন্তমুখী, সে মুখ খুললো মৃত্যুর পরে। অর্থাৎ তার সুইসাইড নোটেই পাওয়া গেল তার মনের কথা ঃ

বাবা, পারিলাম না, তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই। তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। পাপিষ্ঠা ননিবালা।

কাহিনিতে এরপরেই আসবে জগমোহনের মৃত্যুদৃশ্য। কিন্তু সে মৃত্যু নিছক রাতে খেয়ে শুয়ে মহাপ্রয়াণের গল্প নয়। প্লেগে আক্রান্ত মুসলমান চামারকে নিজের বাড়ির প্রাইভেট হাসপাতালে সেবা করতে গিয়ে স্বয়ং আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু, যা যেন তাঁর সেবাব্রতের স্বাভাবিক উজ্জ্বল পরিনতি। ননির মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুর উপস্থাপনা একধরণের poetic justiceও। কোনো আদর্শবাদী মানুষ যদি কাউকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করার পরেও নিজস্ব মূঢ়তায় আত্মঘাতী হয় তাহলেও তার দায় সেই মহাত্মাই নেন। জগমোহনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। কিন্তু মূঢ়মতি ননিবালার মধ্যেও যে একটা পাল্টা ভাবনার সূত্রপাত ঘটাতে পেরেছিলেন চিঠিতে তার পরিচয় পাওয়া যায় — তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি। মনে রাখতে হবে ব্যর্থ বিদ্রোহও বিদ্রোহই বটে।

জ্যাঠামশায় স্বপথে স্বধর্মেই প্রাণত্যাগ করেন। রঘুপতির জীবনে বদল আনে অপর্ণা তার সজীব, সবল উপস্থিতিতে, ভেঙে দেয় বদ্ধ কারা। ননির মৃত্যুর পর জগমোহন ফেরেন তার নিজের কাজেই। কোনো উত্থান, কোনো পরিবর্তনের জায়গাই নেই।

সেবাইত পদ থেকে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে অপসারণ ও দেবত্র সম্পত্তি থেকে অধিকার হারানো উপলক্ষ্যে একটা প্রসঙ্গ উঠে আসতেই পারে। এমন প্রখর নাস্তিক কোন্ অধিকারে এতদিন দেবত্র সম্পত্তির ভাগ ভোগ করছিলেন? হরিমোহন মামলা না ঠুকলে তো দিব্যি চলত এই দ্বিচারিতা!

হরিমোহন কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ অন্য জায়গা থেকে শুরু করেছিলেন, তিনি দাদার কাছে 'পৈতৃক সম্পত্তির অন্যায় অপব্যায়ের নালিশ তুলিলেন'। পৈতৃক সম্পত্তি যখন কারো ভাগে চলে আসে তখন তার ব্যয়ের অধিকারও তারই হাতে থাকে। এমন বোকার মত প্রশ্ন নিয়েই হরিমোহন গেছিলেন কি? জ্যাঠামশায়ের উত্তরের দিকে তাকানো যাক ঃ

তুমি পেট-মোটা পুরুত পাণ্ডার পিছনে যে টাকাটা খরচ করিয়াছ আমার খরচের মাত্রা আগে সেই পর্যন্ত উঠুক, তার পরে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হইবে।

পরের ঘটনা থেকে বোঝাই যায় এই তর্ক আসলে ছিল দেবত্র সম্পত্তির ব্যয় বা

অপব্যয়কে কেন্দ্র করে। জগমোহনের দেবতা সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা অত্যন্ত স্বচ্ছ ঃ

হ্যাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোনো দেবতা তাহা পারে না। আমি সেই আশ্চর্য রহস্য দেখিতে ভালোবাসি, তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি। দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুশি হইতে।

অর্থাৎ হিসেব খুব পরিষ্কার। জগমোহন মানেন মানুষের দেবতাকে। তাঁকে সেবা করাই তাঁর ব্রত। দেবত্র সম্পত্তির কোন অপব্যয় তিনি করছেন না। কিন্তু আদালত যখন নির্দিষ্ট নিরিখে তাঁর এক্তিয়ার তুলে প্রশ্ন ওঠালো তখন নিজের নাস্তিকতা তিনি অস্বীকার করেননি এবং আইন যখন তাঁকে এ পদের অযোগ্য মনে করল তখন প্রতিকার স্বরূপ উচ্চ আদালতে যাবারও ইচ্ছা হয়নি তাঁর। আদালতের সংজ্ঞা অতি নির্দিষ্ট, জগমোহনের alternative religion-র কোনো জায়গা সেখানে নেই। রাষ্ট্র নাস্তিকের ধর্মকে স্বীকৃতি দিতে রাজি নয়।

তপোব্রত ঘোষ যথাযথ কারণেই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসকে 'শ্রীবিলাসের ডায়েরি' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। চতুরঙ্গর জগৎকে আমরা তার চোখ দিয়েই দেখি এবং উপলব্ধি করি এই কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র সে-ই। দুর্ভাগ্যবশত বাংলা সমালোচনার ইতিহাস শচীশের মতো বিভ্রান্ত, অস্বচ্ছ এবং উন্মার্গগামী চরিত্র নিয়ে মেতে থেকেছে। নাস্তিক শ্রীবিলাস যে আশ্চর্য স্বচ্ছতায় ও গভীরতায় জীবনতরি বেয়ে চলেছে সেদিকে আমাদের গভীরভাবে সচেতন করে তোলেন তপোব্রত ঘোষ। শ্রীবিলাস সততার পরাকাষ্ঠা বলেই তার সীমাবদ্ধতা, চ্যুতি, বিভ্রান্তিকে আড়াল করে নি। সংকীর্ণ পরিমণ্ডলী থেকে আসার ফলে সুবর্ণবণিক ও নাস্তিক সম্পর্কে তার সংক্রামিত হীন ধারণাকে গোপন করেনি সে। কিন্তু জ্যাঠামশায়ের সংস্পর্শে থেকে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে তার মধ্যে সেই পরিবর্তন সম্পর্কে কিন্তু সে আগাগোড়া চুপ থেকেছে। জ্যাঠামশায়ের অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়ে ওঠার ফলেই সে তাঁর উইলের একজিকিউটর নির্বাচিত হয়েছিল কিন্তু কাহিনির শেষাংশে যখন এই উইল ব্যবহার করে বাড়ি দখলের প্রসঙ্গ আসে শুধু তখনই সে এই কথাটি উন্মোচিত করে। 'জ্যাঠামশায়' অংশের একেবারে শেষে প্লেগরুগী সেবাকারীদের দলে নিজের নাম উল্লেখ করা ছাড়া শ্রীবিলাস আগাগোড়া চুপ। সে সমস্ত আলো শচীশের উপর পড়তে দিয়েছে এবং আমরা সমগ্র কাহিনি পাঠ করে উপলব্ধি করতে পারি তার জীবনশিখাকে কত গভীরভাবে জ্বালিয়ে গেছেন তিনি এবং সেও আত্মদীপ হতে পেরেছে। শচীশ সেখানে একফুঁয়ে নির্বাপিত হয়েছে।

শ্রীবিলাসের জীবনে কি বিচ্যুতি আসেনি? এসেছে, এবং সে নিজেই নির্মমভাবে প্রকাশিত করেছে তাকে। নীলানন্দ স্বামীর দলে ভীড়ে যাওয়ার ঘটনা তার কাছে নেশা লেগে যাওয়ারই সমান ঃ

ক্রমে ক্রমে নেশায় আমাকেও পাইল; আমিও সবাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম, অশ্রুবর্ষণ করিলাম, গুরুর পা টিপিয়া দিতে লাগিলাম এবং একদিন হঠাৎ কী এক আবেশে শচীশের এমন একটি অলৌকিক রূপ দেখিতে পাইলাম যা বিশেষ কোনো-একজন দেবতাতেই সম্ভব।

এখানেই শেষ নয়, শচীশের ধর্মচর্চাকে সে দেখেছে মদ্যপ্রস্তুতকারীর উপমায়। তপোব্রত ঘোষের ভাষায় কাহিনির শুরুতে যাকে দেখে ব্রাহ্মণ মনে হয়েছিল এখন সে শৌন্ডিকে পরিনত হয়েছে ঃ

একদিন শচীশ কল্পনার খোলা-ভাঁটিতে পূর্ব ও পশ্চিমের, অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্রে চোলাইয়া একটা অপূর্ব আরক বানাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ দামিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো, তোমরা একবার শীঘ্র এসো।

শুধু শচীশ নয়, লীলানন্দ স্বামীর নির্মিত রসের জগৎকেই সে টের পেয়েছে নেশার জগৎ হিসেবে। তাই তার মনে হয় লীলানন্দ যেন এক ধর্মরূপী মদ্যের পরিবেশক মাত্র — তিনি রূপকের পাত্রে ভাবের মদ কেবলই আমাদিগকে ভরিয়া ভরিয়া পান করাইয়াছেন। Opium না হলেও লীলানন্দর religion তার কাছে wine, নেশার বস্তু। এই জগতে অতিরিক্ত আহারের পাশাপাশি চলে অনাহার। দামিনীর স্বামী শিবতোষ যখন লীলানন্দ ও তার চেলাদের উত্তম আহারের আয়োজন করে চলেছিল, সে সময় দামিনীর বাপ ও ভাইরা অনাহারে দিন কাটাচ্ছিল। যেদিন নবীনের স্ত্রী আত্মহত্যা করল সেদিনও লীলানন্দর কাছে শিষ্যের সমাগম থামেনি। থামেনি নাচ-কীর্তন। শ্রীবিলাস তার তীক্ষ্ণ জবানে তথাকথিত ধর্মচর্চার জগতের নির্মমতাকে উন্মোচিত করেছে।

জ্যাঠামশায় মরলেই উধাও হল শচীশ, ঠেকলো লীলানন্দর কাছে। এখানে সে হরিমোহনেরই ছেলে। দুর্বলচিত্ত হরিমোহন ধর্মসহ সমস্ত ক্ষমতাকেন্দ্রকে তুষ্ট রেখে চলতে ভালোবাসেন। এ এক রকমের প্রবলের কাছে দুর্বলের আত্মসমর্পণ। শচীশ বাপের 'ধর্মবুদ্ধি', 'কর্মবুদ্ধি' না পেলেও জিনগত বৈশিষ্ট্য একেবারেই পায়নি এটা বলা যাবে না। সেও কোনো প্রবলকে আশ্রয় করে বাঁচতে ভালোবাসে। কখনো তা জ্যাঠামশায় কখনো তা লীলানন্দ। কিন্তু লীলানন্দর জগতে দামিনীর আবির্ভাব তাকে সমস্যায় ফেলে দিল। সে নারীকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না। লম্পট পুরন্দরের ভাই বলেই সে দামিনীর শোভা দেখে। দামিনীকে দেখতে পায় না। আবার গুহার অভিজ্ঞতার বর্ণনা সে যেভাবে তারিয়ে তারিয়ে লেখে তার মধ্যে সুপ্ত প্রবণতার প্রতিফলন দেখতে পান তপোব্রত ঘোষ। কিন্তু সে শচীশ, নিউটন, ডারউইন, রসতত্ত্ব

ঘাঁটা শচীশ বা এসবে হারিয়ে যাওয়া শচীশ। তাই দামিনীকে মোকাবিলা করতে তাকে বানাতে হয় অভিনব তত্ত্ব ঃ

তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়।

শচীশ তার এই অভিনব তত্ত্ব দামিনীকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করে বিশেষভাবে বোঝাতে চায়। এসম্পর্কে দামিনীর প্রতিক্রিয়া শ্রীবিলাসের কলমে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ফুটেছে — দামিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কিনা জানিনা, কিন্তু শচীশকে বুঝিতে পরিল। এই কথাটির অন্তর্নিহিত শ্লেষ হল শচীশের তত্ত্বের কোনো বিশিষ্টতা নেই, কিন্তু যে মানসিক সংকটের কথা শচীশ তার তত্ত্বে প্রকাশ করছে সেটাই আসল ব্যাপার। দামিনী সম্পর্কে তার দুর্বলতাকে কোনো সুস্থ সমাধানে পৌঁছে দিতে পারছে না সে। তাই রূপের বিপরীতে হাঁটার নামে তার অন্তরের পলায়ন প্রবৃত্তি উন্মোচিত।

যাইহোক 'এতবড়ো সত্য' আবিষ্কার করে ফেলার পরেও দামিনী ঘরের জানলা বন্ধ করতে ঢুকলে ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে পালাতে হয় শচীশকে। দামিনী ও শ্রীবিলাস সেই ভুতের বাড়িতে তাকে রেখে আসার পর তার কার্যকলাপ সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ ফুরোয়। সিরিও কমিকেরও একটা সীমা থাকা দরকার। শ্রীবিলাস প্রকৃত সত্যের সন্ধানী বলেই সুন্দরকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ আধুনিক কবি বলিয়াছেন ঃ Truth is beauty, beauty truth। আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে truth এবং beauty মূর্তিমতী। উপনিষদও বলিতেছেন ঃ আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। যাহাকিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই truth এবং beauty , সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম।"

দামিনীর মৃত্যুর পর শ্রীবিলাস শংকরাচার্যর শরণ নেয় নি। উল্টে বলেছে "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ এ-সব কথা তিনি বলেছিলেন, কিন্তু এর মানে বুঝেন নাই। আমি সন্ন্যাসী নই, তাই আমি বেশ করিয়া জানি দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়।" এই বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে সে আরও এগিয়েছে, "তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া রহিল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে?"

কোঁতের জীবনে ক্লতিলদের ক্ষণিক আবির্ভাব তাঁকে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। যুক্তিনিষ্ঠ পথ চলার একমাত্রিকতার সঙ্গে জীবনে যখন যুক্ত হয় প্রকৃত ভালোবাসা তখনই সত্যান্বেষী মানুষ পৌঁছয় পরিপূর্ণ য়। জ্যাঠামশায়ের জীবনে ননিবালার আবির্ভাব তাঁর প্রতাপান্বিত যুক্তিনিষ্ঠ অস্তিত্বকে কেমন যেন ভিজিয়ে দিয়েছিল। "মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি বুড়োবয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে"র অর্থ

জ্যাঠামশায়ের ব্রতচ্যুতি নয়, জ্যাঠামশায়ের মনের সুপ্ত প্রেমধর্মের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু 'ননি' আর 'দামিনী' নামদুটিতেই যেন এদের তফাৎ করে দিয়েছে। ননি কোমলতাসর্বস্ব, তাই পাষণ্ড পুরন্দরকে ত্যাগ করতে না পারার অগ্নি পরীক্ষায় দগ্ধ হয়ে যায়। প্রচুর মানুষের মধ্যে শচীশের বিরহযন্ত্রণা একদিন টের পেয়েছিলেন জ্যাঠামশায়, ননিবালার মধ্যে তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন এক নারীসত্তাকে যে শুধু পজিটিভিস্টের চোখের 'ম্যাডোনা' নয়, যে পাগলা জগাইয়ের মা। মানুষের থেকে দুরত্ব তৈরি করে abstract প্রেমচর্চার যে জগৎ লীলানন্দ তৈরি করেছিলেন তাতে যুক্তিবাদী শ্রীবিলাসের মনের ক্ষিদে মিটবার নয়। তাকে কাঁপিয়ে দিল দামিনী, যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে। "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের নিবৃত্তি লীলানন্দ ঘটাতে পারেননি, ঘটালো দামিনী। দামিনীকে পেয়ে জ্যাঠামশায়ের পথ থেকে ছিটকে যায়নি শ্রীবিলাস, সে জ্যাঠামশায়কে মাথায় রেখেই জীবনকে পেয়েছে পূর্ণতর প্রসারতায়, মহত্তর বিকাশে ঃ

জ্যাঠামশায়ের আরব্ধ কাজ সে আবার শুরু করেছে বটে কিন্তু এবার তা শুধু প্রচুরতম লোকের জন্য করা নৈর্ব্যক্তিক কাজ নয় — মুসলমান চামার ছেলেদের শিক্ষাদানের কাজের সঙ্গেই মিলে গিয়েছে দামিনীর ভাইপো-ভাইঝিদের জন্য নিঃস্বার্থ ও প্রতিদান-প্রত্যাশাহীন ব্যক্তিগত কাজ। 'ব্যক্তিগত' এই অর্থে যে তারা দামিনীর আত্মীয়, প্রচুরতম লোকের কয়েকটি একক নয়।

(*শ্রীবিলাসের ডায়েরি ঃ* তপোব্রত ঘোষ)

(৩)

আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ নিয়ে যা তাঁর বেড়ে ওঠার পিছনে সুস্পষ্ট প্রভাব রেখেছে। সামাজিক কৌলিন্য হারানো সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের জগমোহন মল্লিকের সামাজিক বিদ্রোহ এবং অবদমিত মুসলমানদের সম্পর্কে তার সহানুভূতির পিছনে তপোব্রত ঘোষ ব্রাত্যর সামাজিক প্রতিষ্ঠানবিরোধী মানসিকতার ছাপের কথা উল্লেখ করেছেন। কথাটা পিরালির ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তা পত্রপুটের 'ওরা ব্রাত্য ওরা মন্ত্রবর্জিত' কবিতাতেই দেখেছি আমরা। ব্রাত্য 'আমি' আর ব্রাত্য 'ওরা' এখানে বদ্ধ হয়েছে এক মিলনসূত্রে। তাই সামাজিক ধর্মচর্চা ও ঈশ্বরচর্চার বাইরে তৈরি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মানব পূজার মন্দির, যা কোনো চারদেওয়ালের সৌধে আবদ্ধ নয়। আবদ্ধ নয় ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ছকে বাঁধা গণ্ডিতে।

পরিবার থেকে ব্রাত্যসত্তা অর্জনের পাশাপাশি নিজের পরিবারেও নিজের মুদ্রাদোষে কোথাও আলাদা হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ৩০ জুন ১৯৪১ তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "মেয়েরা যে কত স্নেহ ঢেলে দিতে পারে সেই দেখলুম

যখন নতুন বৌঠান আমাকে হাতে নিলেন। আমি তো বাড়ির কালো ছেলে, সেই কালো ছেলেকে তিনি কতখানি স্নেহ করতেন, এখন তা বুঝতে পারি''। এই বাঁধভাঙা স্নেহ বিকচমান কবিচিত্তে জন্ম দিল প্রেমের, যে প্রেম সামাজিক ভাবে স্বীকৃত নয়। কিন্তু এই তথাকথিত অসামাজিক প্রেমই হয়ে উঠল তাঁর নৈতিকতার নিয়ামক — তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা/এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা। কাদম্বরী হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা যাঁর সঙ্গে তথাকথিত ঈশ্বরিকতার কোনো সংযোগ নেই। এই ভালোবাসাই বৈষ্ণব কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে লেখালো — দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা। আবার ফিরি পত্রপুটের 'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত' কবিতায় ঃ

আমার ভলোবাসার আর একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারই অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্ব দেহে মনে
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের দীপশিখা।

এই 'চিরবিরহের দীপশিখা' যে দামিনী ও শ্রীবিলাসের অন্তরে জাগিয়েছিল সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তপোব্রত ঘোষ। এই দীপশিখাই তাকে চিনিয়েছে সত্য ও সুন্দরকে। কাদম্বরীর অকালপ্রয়াণ তথা আত্মঘাত রবীন্দ্রনাথকে ভেঙে ফেলেনি বরং নির্মাণ করেছে তাঁকে। কৃষ্ণ কৃপালনির ভাষায় "It did not break him, it made him"। জ্যাঠামশায়ের চেলা শ্রীবিলাস খবরের কাগজে তার ও দামিনীর বিবাহ নিয়ে কটূক্তিকে উপভোগ করেছে, জ্যাঠামশায়ের মত সেও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অস্বস্তিতে আনন্দ পায়। কিন্তু যে শ্রীবিলাস নীলকুঠির বিলিয়মান সত্তার পাশাপাশি দামিনীর স্থায়িত্বের কথা উপলব্ধি করে তার চেতনায় একাকার হয়ে গেছে প্রেম ও ন্যায় বোধ। পত্রপুটের কবিতাও যেখানে এসে পৌঁছেছিল ঃ

ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে
ওকে দেখেছি বিধাতার বাম পাশে;
দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত
কদর্য-কঠোরের অশুচি স্পর্শে
তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে

বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি,
ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়।

রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালো 'মানুষের ধর্ম'র আরাধ্য মানব। সুখরঞ্জন রায় বিচিত্রায় লিখেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য মোটামুটি 'নারী' ও 'মানব' এই দুই দিক অবলম্বন করিয়া দুই ধারায় ছুটিতেছে। নারীর ধারা মর্ত্যনারী হইতে শুরু করিয়া মানসসুন্দরীর ভিতর দিয়া জীবনদেবতার ধারণায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, মানবের ধারা দেবজীবনের ভিতর দিয়া বিশ্বজীবনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে'। পত্রপুটের কবিতা এবং 'চতুরঙ্গ' উভয় ক্ষেত্রেই আমরা দেখলাম নারীপ্রেম রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনা, মানবপ্রেম এবং সামাজিক কলুষতার বিরোধী অবস্থানের সঙ্গেই অন্বিত। জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর কবিমানসীতে এই সামগ্রিকতার ছবিই এঁকেছেন ঃ

গীতাঞ্জলি পর্ব পেরিয়ে ধর্মশাস্ত্রসম্মত ঈশ্বরচেতনা রবীন্দ্রনাথের মন থেকে ক্রমশ স্খলিত হয়ে পড়লেও, তিনি তাঁর নিজের ঈশ্বরীকেই সকলের ঈশ্বরী করে তুলে 'মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা'র ধারণায় এসে পৌঁছলেন। প্লেটোর জীবন-দেবতা মানুষকে শুধু ঈশ্বরের সঙ্গেই মেলান, জগদীশ ভট্টাচার্য দেখালেন রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা ব্যক্তিমানুষকে মিলিয়েছেন সর্বমানবের সঙ্গে।

(রবীন্দ্র জিজ্ঞাসুর ডায়রী ঃ তপোব্রত ঘোষ)

পত্রপুটে ব্রাত্য কবির পূজা তাই সমাপ্ত হয় দেবলোক থেকে মানবলোকে, আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে আর মনের মানুষ আমার অন্তরতম আনন্দে। সাম্যবাদে বিশ্বাসী নাতি সৌম্যর প্ররোচনায় লেখা 'সভ্যতার সংকটে'র মর্মগানে মহামানবের আবির্ভাবে তাই সুরলোকে শঙ্খ বাজে আর তার সঙ্গে মিলে যায় নরলোকের জয়ডঙ্ক। দেবলোক থেকে মানবলোক, আকাশ থেকে মাটিতে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ব্যাপ্ত, তাঁর মুক্তি আকাশের আলোয় আলোয়, ধরণির ধুলায় ধুলায়, ঘাসে ঘাসে। আকাশের জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁকে ছাড়েন নি, কিন্তু মনের মানুষও নিয়ে নিয়েছে এক আশ্চর্য অসীম বিস্তারে।